আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মুরজিয়া মতবাদ, নেক আমল, মুজিযা-কারামত, আখিরাত, ঈমান-ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ৫. উজব

উজব (العُجْب) শব্দের আত্মতৃপ্তি বা আত্মগরিমা। আজব (العَجَب) অর্থ অবাক হওয়া, আশ্চার্যান্বিত হওয়া বা তাজ্জব হওয়া। নিজের কর্মে বা মতে নিজেই অবাক হওয়া, পরিতৃপ্ত থাকা বা আত্মগরিমায় ভোগাকে উজ্ব বলা হয়।

উজব, আত্মতৃপ্তি বা আত্মগরিমা অহঙ্কারের একটি দিক। অহঙ্কার, এর প্রকাশ ও প্রতিরোধ বিষয়ে ‘‘রাহে বেলায়াত’’ গ্রন্থে আলোচনার চেষ্টা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, নিজেকে অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে উন্নত, ভালো, উত্তম বা বড় মনে করা, অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে হেয় মনে করাই কিবর, তাকাববুর বা অহঙ্কার। এটি মূলত একটি মানসিক অনুভূতি, তবে কর্মের মধ্যে অনেক সময় তার কিছু প্রভাব থাকে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا

‘‘নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।’’[1]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

‘‘তুমি মানুষের জন্য তোমার ঘাড় বক্র কর না এবং তুমি পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।’’[2]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

‘‘যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার বিদ্যমান সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’’ তখন এক ব্যক্তি বলেন, ‘‘মানুষ তো ভালবাসে যে তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক ....।’’ তিনি বলেন: ‘‘আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য

ভালবাসেন। অহঙ্কার হচ্ছে সত্য অপছন্দ করা ও মানুষদেরকে অবজ্ঞা বা হেয় করা।’’[3]

অহঙ্কার মহান আল্লাহর অধিকার। কোনো মানুষের জন্য অহঙ্কার করা মূলত আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ। কারণ, অহঙ্কারের বিষয় সর্বদা আল্লাহর নিয়ামতেই হয়। পৃথিবীর সকল নিয়ামত আল্লাহ সবাইকে সমানভাবে প্রদান করেন না। কাউকে দেন, কাউকে দেন না অথবা কমবেশি প্রদান করেন। যিনি নিয়ামত পেয়েছেন তার দায়িত্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু যদি তিনি এ নিয়ামতকে আল্লাহর দয়ার দান বা ভিক্ষা হিসাবে গ্রহণ না করে নিজস্ব উপার্জন ও সম্পদ মনে করেন তখনই অহঙ্কারের শুরু হয়। এতে প্রথমেই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বেশি নিয়ামত-প্রাপ্ত বান্দার দায়িত্ব কম নিয়ামত প্রাপ্ত কোনো বান্দাকে দেখলে প্রথমত আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয়ত কম নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধাভরে আচরণ করা।

অহঙ্কার ধ্বংসের পথ। সবচেয়ে নোংরা অহঙ্কার ‘‘ধার্মিকতার অহঙ্কার’’ বা ‘উজব’। ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগির কারণে বা কোনো বিশেষ ধর্মীয় দলের অনুসারী হওয়ার কারণে নিজেকে অন্য কারো চেয়ে বেশি ধার্মিক বলে মনে করা বা নিজের ধার্মিকতায় সন্তুষ্টি বোধ করাই ‘‘উজব’’। বস্তুত এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। এর বড় কারণ নিজের পাপ ও দুর্বলতার দিকে না লক্ষ্য করে অন্য মানুষের পাপ-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মুকাবিলায় আসলেই কিছু গ্রহণযোগ্য নেক আমল করতে পেরেছি কিনা তার ঠিক নেই, যা কিছু করেছি তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়েছে কিনা তারও ঠিক নেই, মৃত্যু পর্যন্ত এ আমল ধরে রাখতে পারব কিনা তারও ঠিক নেই, এরপরও মুমিন কিভাবে নিজেকে অন্যের চেয়ে অধিক ধার্মিক বলে চিন্তা করতে পারেন?! ধ্বংসের জন্য এর চেয়ে বড় পথ আর কিছুই হতে পারে না।

এজন্য হাদীস শরীফে ‘‘উজব’’-কে পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আনাস (রা) বলেন,
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:
لَوْ لَمْ تَكُوْنُوْا تُذْنِبُوْنَ لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعُجْبُ الْعُجْبُ.

‘‘তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে আমি তোমাদের জন্য পাপের চেয়ে ভয়ঙ্করতর বিষয়ের ভয় পেতাম, তা হলো উজ্ব, তা হলো উজ্ব।’’[4]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

‘‘ধ্বংসকারী স্বভাবগুলি হলো (১) আনুগত্যকৃত লোভগুকৃপণতা, (২) অনুসরণকৃত প্রবৃত্তি এবং (৩) নিজের বিষয়ে মানুষের পরিতৃপ্তি।’’[5]

ঈমানের অহঙ্কার, ইলমের অহঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে উমার (রা) বলেন:

مَنْ قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ قَالَ هُوَ عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ وَمَنْ قَالَ هُوَ فِيْ الْجَنَّةِ فَهُوَ فِيْ النَّارِ.

‘‘যে ব্যক্তি বলে: আমি মুমিন সে কাফির, যে ব্যক্তি বলে: আমি আলিম সে জাহিল এবং যে ব্যক্তি বলে: আমি জান্নাতী সে জাহান্নামী।’’[6]

উজব বা আত্মতৃপ্তি ও আত্মগরিমার একটি প্রকাশ সকল মানুষের মধ্যে ত্রুটি দেখা এবং নিজে বা নিজের মতাবলম্বী ছাড়া সকলেই খারাপ পথে চলছে বলে দাবি করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ (إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُوْلُ) هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

‘‘যদি কেউ বলে- যদি শুন যে কেউ বলছে-: মানুষেরা ধ্বংস হয়ে গেল, তবে সেই সবচেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত।’’[7]

অহঙ্কার, আত্মতৃপ্তি বা আত্মগরিমার একটি প্রকাশ ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে অন্যান্য মানুষদের উপহাস করা, অবজ্ঞা করা। যদি সত্যিই কেউ বাহ্যিকভাবে উপহাস বা অবজ্ঞার যোগ্য হয় তাকেও উপহাস করা যায় না; কারণ হতে পারে আল্লাহর কাছে সে উত্তম। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘‘হে মুমিনগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস-বিদ্রূপ না করে; হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। কোনো নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ-উপহাস না করে; হতে পারে সে বিদ্রূপকারিণী অপেক্ষা উত্তম। আর তোমরা একে অপরকে নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধি দিয়ে ডেকো না। ঈমানের পর পাপী নাম পাওয়া খুবই খারাপ বিষয়। আর যারা তাওবা করে না তারাই যালিম।’’[8]

‘‘উজব’’ ইহূদী-খৃস্টানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারা নিজেদের আল্লাহর ওলী, আওলাদে রুসুল বা নবীগণের আওলাদ, আল্লাহর সমন্তান ও আল্লাহর খাঁটি আবিদ বলে দাবি ও প্রচার করত। এসকল বিষয়ে তারা তাদের বংশ, কাশফ, কারামত, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদির দোহাই দিত। খৃস্টানগণ এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর ছিলেন। যে কোনো পাঠক খৃস্টান সাধু ও পাদরিদের লেখা কাহিনী পড়লে এ জাতীয় অগণিত দাবি দেখবেন। মহান আল্লাহ তাদের এ সকল দাবি-দাওয়াকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করে বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا

‘‘তুমি কি দেখ নি যারা নিজেদের পরিশুদ্ধতা দাবি করে। বরং আল্লাহ যাকে চান পরিশুদ্ধ করেন আর তাদেরকে সূতা পরিমাণ জুলুমও করা হবে না। দেখ, কিভাবে তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটনা করে। আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট।’’[9]

এ জাতীয় ‘উজব’ বা দীনদারির আত্মগরিমা প্রকাশক সকল বিষয় কুরআন ও হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

এমনকি ‘নেককার’ বা ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও দীনদারি বোধক নাম বা উপাধি ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

“অতএব তোমরা নিজেদের আত্মপ্রশংসা বা পরিশুদ্ধতা-পবিত্রতা বর্ণনা করো না, কে মুত্তাকী তা তিনি অধিক জানেন।”[10]

যে নামের অর্থ দ্বারা ব্যক্তিকে নেককার বুঝা যায় সে নাম রাখতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপত্তি করতেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর কন্যা যাইনাব বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الاسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আমার নাম রাখা হয় “বার্রা” (পুণ্যবতী)। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: তোমরা নিজেদের আত্মপ্রশংসা করো না বা নিজেদের ‘নেককার’ হওয়ার মত কোনো কথা বলো না। তোমাদের মধ্যে পুণ্যবান-পুণ্যবতী কে তা আল্লাহ অধিক অবগত আছেন। তখন তারা বলেন, আমরা তার নাম কী রাখব? তিনি বলেন: তার নাম রাখ যাইনাব।”[11]

উল্লেখ্য যে, সুন্দর দেখতে একটি আরবীয় গাছের নাম “যাইনাব”। এ গাছের নামে আরবে মেয়েদের “যাইনাব” নাম রাখার প্রচলন ছিল। এ সকল নাম ব্যক্তির সৌন্দর্য প্রকাশ করে, কিন্তু তার নেক আমল প্রকাশ করে না। এজন্য তিনি এরূপ নাম রাখার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি নেক আমল প্রকাশক নাম রাখতে নিষেধ করেন।

ইসলামের বরতকময় তিন যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে “তাযকিয়া”-বোধক, অর্থাৎ ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক বোধক নাম ও উপাধি ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে। প্রথম তিন যুগে উপাধির ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। একটু পরের যুগে সামান্য উপাধি যা ব্যবহার করা হতো তা বাহ্যিক পেশা বা বাহ্যিক আমল অনুসারে। যেমন কখনো কখনো কারো সম্পর্কে বলা হতো: আলেম, কারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, যাহেদ বা সংসারত্যাগী, সালেহ বা নেককর্মশীল, ইমাম বা নেতা ইত্যাদি। এগুলিও তাবে-তাবেয়ীগণের পরের যুগে ব্যবহার করা হতো, উপাধি হিসবে নয়, বরং মৃত্যুর পরে জীবনী বর্ণনার প্রয়োজনে বলা হতো এবং অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হতো। বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কতটুকু তা নিয়ে উপাধি তৈরি করা হতো না।

গাওস, কুতুব, মুহিউস সুন্নাহ, কামেউল বিদ‘আত, ইমামুল আইম্মাহ, গওস, গাওসে আ’জম, গাওসে সাকালাইন, মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আযম, মুজাদ্দিদে যামান, ওলীয়ে কামেল, হাদীয়ে জামান, কুতুব, কুতুবে রাববানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে এরশাদ, খাজা, আশেকে রাসূল, ওলীকুল শিরোমণি, সূফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, মাহবুবে সোবহানী, কেবলা, কাবা ইত্যাদি ইত্যাদি অগণিত উপাধির কোনোকিছুই তাঁরা কখনোই ব্যবহার করেননি। কারো

জীবদ্দশায় তো নয়ই, এমনকি কারো মৃত্যুর পরেও তাঁর নামের সাথে এরূপ কোনো উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না।[12]

এ সকল উপাধি ব্যবহার সুন্নাহ বিরোধী নিষিদ্ধ কর্ম। যেখানে সাধারণ ‘‘বার্রা’’ বা পুণ্যবতী নাম পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাখতে দেন নি, সেখানে এ জাতীয় গালভরা উপাধিগুলো তাঁর কাছে কত বেশি অপছন্দনীয় তা চিন্তা করুন। বস্তুত এ সকল উপাধী উপাধিপ্রাপ্ত ও তার অনুসারীদের মধ্যে ‘‘উজব’’ সৃষ্টি করে। সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ও আমাদের রুচিকে সুন্নাত অনুসারে সংশোধন করা দরকার।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম দু ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসূফ তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার ওফাতের পরে তাঁর মতামত সংকলন করে অনেক বই লিখেন। এ বইয়েও তাঁদের কিছু বক্তব্য আমরা দেখছি। তাঁরা ‘রাহিমাহুল্লাহ’ বা ‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’ বলা ছাড়া কোনো উপাধি ব্যবহার করেননি। অগণিত স্থানে শুধু লিখেছেন: আবু হানীফা বলেছেন, আবু হানীফা রাহিমহুল্লাহ বলেছেন, আবু হানীফার মত, আবু হানীফা রাদিআল্লাহু আনহুর মত ইত্যাদি। ইমাম, ইমামুল মুহাদ্দিসীন, ইমাম আ’যম, ইমামুল আইম্মাহ, ফকীহকুল শিরোমণি, ওলীকুল শিরোমণি, গওসে সামদানী ইত্যাদি একটি উপাধিও তাঁরা তাঁর জন্য ব্যবহার করেননি। তাঁদের সকল ভক্তি প্রকাশ করেছেন একটি বাক্যে: ‘রহিমাহুল্লাহ’ বা ‘রাদিআল্লাহু আনহু’।

আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফার দু ছাত্র আবূ মুতী ও আবূ মুকাতিল আল-ফিকহুল আবসাত ও আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম গ্রন্থদ্বয়ে ইমামের নাম উল্লেখের সময় কোনো উপাধি ব্যবহার করেননি। শুধু লিখেছেন: ‘‘আবূ হানীফা বলেন’’ বা ‘‘আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন’’।

ফুটনোট

[1] সূরা (৪) নিসা: ৩৬ আয়াত।

[2] সূরা (৩১) লুকমান: ১৮ আয়াত।

[3] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৩ (কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরীমিল কিবরি ওয়া বায়ানিহী)

[4] আলবানী, সহীহুল জামি ২/৯৩৮ (নং ৫৩০৩)। হাদীসটি হাসান।

[5] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১২। হাদীসটি হাসান লিগাইরহী।

[6] ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৩২ (সূরা নিসার ৪৯ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)

[7] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০২৪ (কিতাবুল বির্রি..., বাবুন নাহই আন কাওলি: হালাকান্নাস)।

[8] সূরা (৪৯) হুজুরাত: ১১ আয়াত।

[9] সূরা (৪) নিসা: ৪৯-৫০ আয়াত।

[10] সূরা (৫৩) নাজম: ৩২ আয়াত।

[11] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৮৬ (কিতাবুল আদাব, বাবু ইসতিহবাবি তাগয়ীরিল ইসমিল কাবীহ)।

[12] বিস্তারিত দেখুন, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৫০৮-৫১৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7234

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন